হত্যাদির ...
দেওয়া হত না। ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান এক সাধারণ ঘোষণায় বেগার প্রথা নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি সফল হয়েছিলেন তা বলা যায় না।

৬.১০ ঋণদান ও মহাজনী

ড. ইরফান হাবিব মুঘল সাম্রাজ্যে বিস্তৃত বাণিজ্যের পেছনে এক ঋণদান ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন। অগ্রিম অর্থের জোগান ছাড়া বাণিজ্য কাঠামো বজায় রাখা কঠিন এবং সেই অর্থের জোগান আসত এক প্রসারিত ঋণদান ব্যবস্থার সাহায্যে। এটি অবশ্য নতুন নয়। প্রাচীনকাল থেকেই ঋণদান ও গ্রহণ ছিল শাস্ত্রসম্মত এবং *মনুস্মৃতি*-তে তার বিস্তারিত সূচিও সন্নিবেশিত আছে। এভাবেই ভারতে দীর্ঘদিনযাবৎ এক বিশেষ বর্ণের বিকাশ ঘটেছিল যারা এই মহাজনী ব্যাবসাকে টিকিয়ে রাখে। সুলতানী রাজত্বেও তাদের অস্তিত্ব দেখা যায়। মুসলমান অভিজাতরা বাণিজ্যকে ভালো চোখে দেখত না। ফলত দেশে নগদ অর্থের জোগান বজায় রাখার কাজে ওই মহাজনদের ভূমিকা ছিল অবিসংবাদী।

সপ্তদশ শতকে সাধারণ বণিকরা তো বটেই, বহু সময়ে *জাগীরদার*-রাও মহাজনদের দ্বারস্থ হত। নগদ অর্থের জোগান সারা বছর সমগ্র সাম্রাজ্যে একই হারে না থাকায় সমস্যা ছিল প্রচুর। বাণিজ্যিক পণ্য বহুলাংশে ছিল কৃষিপণ্য বা কৃষিনির্ভর পণ্য যা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে সংগ্রহ করতে হত। এগুলির জন্য প্রয়োজনীয় নগদ অর্থের জোগানদার ছিল মহাজনরা। সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে ধনী বণিকরাই বাণিজ্যিক অর্থ জোগাত। এদের মধ্যে বারবার গুজরাটের বিরজি ভোহরার নাম পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় মহাজনী ব্যবসাই একটি পৃথক ধারার সৃষ্টি করে। জগৎশেঠ পরিবার অন্যান্য বাণিজ্য ত্যাগ করে প্রধানত ঋণদানের ব্যবসাতেই অধিক জড়িত হয়।

মুঘল রাজত্বে ভারতে ঋণদান পদ্ধতি যা মূলত বাণিজ্যিক প্রয়োজনে চালু ছিল তাকে বলা হত হুণ্ডি। সাধারণভাবে নির্দিষ্ট কিছু সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট অঞ্চলে নগদ অর্থের জোগান হুণ্ডির মাধ্যমে দেওয়া হত। বলা হয় যে এর ফলে নগদ অর্থ সঙ্গে নিয়ে যেমন যাতায়াতের সমস্যা দূর হয়েছিল তেমনি প্রয়োজনমতো অর্থ সংগ্রহেরও সুবিধা হয়েছিল। হুণ্ডি যার কাছ থেকে সংগ্রহ করা হত তাকে নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতে হত এবং সেই সঙ্গে অর্থ আদান-প্রদান বাবদ বীমার মাশুলও দিতে হত। সপ্তদশ শতকে বাংলা থেকে রাজস্ব নগদ অর্থ বলদের পিঠে আগ্রায় নিয়মিত পাঠানো হত। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে জগৎশেঠ হুণ্ডি-র সাহায্যে মুর্শিদাবাদ থেকে দিল্লিতে ওই রাজস্ব পাঠাত, নগদে নয়। হুণ্ডি যে-কোনও সময়ে হস্তান্তরের সুযোগ থাকায় আধুনিককালের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে তার এক নিকট সাযুজ্য পাওয়া যায়। এই জাতীয় নগদের ব্যবসা যারা পরিচালনা করত তাদের *সরাফ* বা *সরফ* বলা হত। মুঘল রাজত্বে বাণিজ্যের প্রসারে *সরাফ*-দের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। এরা যে শুধুমাত্র নগদের জোগান দিত তা নয় তারা বিভিন্ন ধরনের মুদ্রার বিনিময়ও করত। ফলত বিদেশি বণিকরা অন্য দেশের নগদ মুদ্রা ভারতীয় বন্দরে নিয়ে এলে এদের কাছেই সেসব ভারতীয় মুদ্রায় বিনিময় করে নিত।

এই মহাজনী পদ্ধতির হাত ধরেই ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয় এবং নগদ অর্থের সঞ্চয় হতে থাকে। *সরাফ*-রা ব্যাপক হারে *আমানত* গ্রহণ করত এবং নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে সেসব হস্তান্তর করত। ড. তপন রায়চৌধুরীর গবেষণায় দেখা যায় যে, ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে এই ধরনের ব্যবসার সুযোগ দেওয়ার জন্য *সরাফ*-রা বার্ষিক ২.৫ শতাংশ হারে *আমানত* গ্রাহকদের কাছ থেকে সুদ আদায় করত। মোটামুটি একই হারে সুরাটে *আমানত* পাওয়া যেত। তবে যে-কোনোরকম বিপর্যয়ের দায়িত্ব *সরাফ*-রা গ্রহণ করত। অবশ্য আমরা বীমার উল্লেখ পূর্বেই করেছি। এমন ঘটনাও ঘটত যেখানে সরকারি আমলারা সরকারি কোষাগারের অর্থ নিজেদের নামে *সরাফ*-দের কাছে গচ্ছিত রেখে সুদ আদায় করত। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যবিবরণীগুলি থেকে জানা যায় যে সপ্তদশ শতকে ঝুঁকির তারতম্য ভেদে মহাজনরা বার্ষিক ১৪ থেকে ৬০ শতাংশ সুদের হারে ঋণদান করত। পণ্যবাহী জাহাজের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মেই সুদের হার ছিল অধিক।

মহাজনরা যেমন প্রয়োজনে অভিজাতদের ঋণ দিত তেমনি উলটো ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়। সরকারি কোষাগার ও অভিজাতদের সঞ্চিত অর্থকে ঋণদানের ব্যবসায় নিয়োজিত করা খুবই স্বাভাবিক ছিল। ড. রায়চৌধুরী দেখিয়েছেন যে, শাহজাহানের রাজত্বকালে একাধিক ক্ষেত্রে সরকারি কোষাগার থেকে বণিকরা ঋণগ্রহণ করেছে। বিনিময়ে অবশ্য সরকার নীল উৎপাদন ও বিক্রির ওপর একচেটিয়া অধিকার কায়েম করে নিত। একবার একজন বণিককে নীল ব্যবসার জন্য ৫ লক্ষ টাকা মূলধন দিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে চুক্তি করা হয়েছিল।

আবার উলটো দিকে বাংলার জগৎশেঠ পরিবারের উত্থানের পেছনে ছিল রাজকীয় কোষাগার পরিচালনার সুযোগ। এই পরিচালনার সুযোগ ঘটে অদ্ভুত পথে। শায়েস্তা খান

বাংলার *সুবেদার* থাকাকালে বণিকদের তাঁর কাছ থেকেই ঋণ নিতে বাধ্য করতেন। মনে রাখতে হবে যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল মুঘল ভারতে ইসলামের পুনর্জাগরণ স্বরূপ অনেকের কাছে মনে হতে পারে। কিন্তু ইসলামের বিধিনিয়মকে জলাঞ্জলি দিয়ে আওরঙ্গজেবেরই মাতুল বাংলার সরকারি কোষাগারকে কাজে লাগিয়ে যথেচ্ছ সুদ আদায় করতেন। এইভাবে ঋণদান ব্যবসা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই জগৎশেঠ পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

একদম নীচুতলায় গ্রামের *সাহু* ও *স্বর্ণকাররা* সুদে টাকা ধার দেওয়ার ব্যাবসা চালাত। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাজারে পণ্য সংগ্রহের মরসুমে সেই ঋণ গ্রহণ করা হত এবং অল্পদিনের মধ্যে তা ফিরিয়ে দেওয়া হত। আবার সাধারণ গৃহস্থকে তার প্রয়োজনমতো অর্থ এরাই জোগাত। গ্রামীণ কারিগর শ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যও এই মহাজনদের প্রয়োজন ছিল। প্রথমত প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ এবং দ্বিতীয়ত কর্মহীন অবস্থা—এই দুটি ক্ষেত্রেই কারিগরদের দরকারমতো অর্থ সংগ্রহের জন্য মহাজনদের কাছেই যেতে হত। কিন্তু এই জাতীয় ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার কী ছিল সে বিষয়ে বিশেষ তথ্য নেই।

বড়ো বড়ো বণিকদের ঋণদানের ক্ষেত্রে আগ্রা ও সুরাটে মোটামুটিভাবে মাসিক ৬ থেকে ১২ শতাংশ হারে সুদ ধার্য করা হত। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের বাংলায় কৃষকদের বার্ষিক ১৫০ শতাংশ হারে ঋণ গ্রহণ করতে দেখা যায়। করমণ্ডল উপকূলে বাণিজ্যের স্বার্থে গৃহীত অর্থের ওপর মাসিক সর্বোচ্চ ৩৬ শতাংশ হারে সুদ আদায়ের তথ্য আছে। বোঝাই যাচ্ছে যে, নগদ অর্থের জোগান চাহিদা অনুযায়ী না থাকার কারণে সুদের হার ছিল এত চড়া। আবার বহু সময়ে খাতকরা কথার খেলাপ করত এবং পলায়ন করত। ফৌজদারি বিধি সেইমতো না থাকায় মহাজনদের ঝুঁকির পরিমাণও ছিল যথেষ্ট বেশি।

মুঘল ভারতে পণ্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গেও ব্যবসা ও সুদের সম্পর্ক ছিল। ড. ইরফান হাবিবের মতে, ১৬১০ থেকে ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। তিনি এই তথ্য পেশ করেছেন ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দকে ভিত্তিবর্ষ হিসাবে ধার্য করে। ওই বছরের পণ্যমূল্যের নিরিখে আলোচ্য দশকগুলিতে আগ্রায় কৃষিপণ্যের, গুজরাটে চিনির, বায়ানা ও সরখেজে নীলের মূল্যবৃদ্ধির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। একই সঙ্গে সোনা ও তামার দরেও কিছু বৃদ্ধি ঘটে। দ্রব্যমূল্যজনিত কারণেই রুপোর মুদ্রার ব্যবহার ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দের তুলনায় ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ড. আজিজা হাসান বিস্তারিত লিখেছেন।

কিন্তু আওরঙ্গজেবের রাজত্বের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৬৬০-এর দশকের শুরুতে অকস্মাৎ সোনা ও তামার দরে ব্যাপক বৃদ্ধি হয়। অবশ্য বায়ানার নীলের দরেও বৃদ্ধি ঘটে। যদিও পরবর্তী কয়েক বছরে কৃষিপণ্যের দর নেমে গিয়েছিল তথাপি সে দর ১৬৩০-এর দশকের দরের অনুপাতে ছিল বেশি। ১৭১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোটামুটি বাজারদর স্থিতিশীল ছিল কিন্তু তা ছিল উচ্চহারে বাঁধা। লক্ষণীয়ভাবে ১৬৩০ থেকে ১৬৮০-এর দশক পর্যন্ত সময়কালে রুপোর মুদ্রায় প্রচলনে ঘাটতি দেখা দেয়। সেই ঘাটতি পূরণ করে তামার মুদ্রা। ড. হাসানের তথ্য অনুযায়ী, ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দের পর দ্রব্যমূল্যে যে স্থিতিশীলতা আসে তার অন্যতম কারণ ছিল বাজারে নগদ অর্থের জোগান হ্রাস পাওয়া।

Scanned with CamScanner

নগদ অর্থের অভাবজনিত কারণে স্বাভাবিকভাবেই সুদের হার ছিল বেশি। মুঘল সাম্রাজ্যের অধিকাংশ সময়কালে রুপো ও তার সঙ্গে সোনার দরে হ্রাস ঘটতে থাকায় ওই দুটি মূল্যবান ধাতু সঞ্চয়ের আগ্রহ ছিল কম। এই জাতীয় পরিস্থিতিতে ধনী ব্যক্তিরা মহাজনী ব্যবসায় আগ্রহী হয়। সপ্তদশ শতকে ভারতে সোনা-রুপোর জোগান কম ছিল না। এই সোনা-রুপোকেই মহাজনী ব্যবসাতে খাটানো হত। আবার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটলে বা মুদ্রাস্ফীতি হলে বণিকদের লাভের পরিমাণও হত অধিক। সুতরাং তাদের পক্ষে চড়া হারে সুদে ঋণ গ্রহণ করে তা বাণিজ্যে বিনিয়োগ করায় কোনও ক্ষতি ছিল না।

সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সুদের হার নিম্নমুখী হয়। ড. হাবিব মন্তব্য করেছেন যে, সেই সময়ে বিশ্বের সর্বত্রই সুদের হার কম ছিল। সুদের হার কম হওয়ার ফলে বাজারে নগদের প্রচলন তুলনামূলক হারে বেশি হল। এর পরোক্ষ ফলস্বরূপ নগরায়নের পথ প্রশস্ত হয়।

৬.১১ মুঘল রাজত্বে ভারতের গ্রামীণ বাণিজ্য

ভারতের বিশালতা, তার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, জলবায়ুর বিভিন্নতা এবং অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা ইত্যাদির পার্থক্যের কারণে ভারতের গ্রাম ও গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কে এক নিমেষে কিছু বলা বড়ো কঠিন। অর্থনৈতিক জীবনের মাপকাঠিতে মুঘল রাজত্বের যে মূল্যায়ন করা হয় তাতে গ্রামীণ বাণিজ্য এবং বণিকদের একটি প্রধান ভূমিকা আছে। সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান হারে নগদে ভূমিরাজস্ব আদায়ের চেষ্টা, যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার, কেন্দ্রের সঙ্গে সুবাগুলির প্রশাসনিক যোগসূত্র এবং সর্বোপরি বাণিজ্যের বৃদ্ধি গ্রামগুলি শহর তো বটেই অগণিত *মণ্ডি* ও *কসবা*-র সঙ্গে যুক্ত ছিল। আবার প্রতিটি পরগনাতেই কমবেশি একাধিক কারিগরী শিল্পকেন্দ্র ও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, যাদের বলা হত *কাটরা* বা *মহল*। ড. বি. আর. গ্রোভার মনে করেন যে, এই *কাটরা*-গুলি ছিল গ্রাম ও *কসবা*-র যোগসূত্র। *কসবা*-কে তিনি শহরের অংশ না বলে গ্রামের অংশ হিসাবেই মনে করেন। বড়ো বড়ো গ্রামগুলিতে (*মুয়াজাই-ই-কলান*) একাধিক *মণ্ডি* পাওয়া যেত যেখানে নানাবিধ পণ্য, কারিগরী পণ্য এবং গবাদি পশু বিক্রি হত। এই *মণ্ডি*-গুলি ছিল গ্রামীণ বাজার যাদের আয়তনের কোনও নির্দিষ্ট মাপ যেমন ছিল না, তেমনি পণ্য লেনদেনেরও কোনও নির্দিষ্ট চরিত্র বহু ক্ষেত্রে ছিল না। *মণ্ডি* ছিল সেই কেন্দ্র যেখানে গ্রামীণ উদ্বৃত্ত যেমন শহর বা *কসবা*-মুখী ছিল তেমনি বাইরের পণ্য যা অধিকাংশ ছিল কারিগরী, তা গ্রামে প্রবেশ করত। *মণ্ডি*-গুলি ছিল *ব্যাপারী*-দের (বণিক) প্রধান কর্মস্থল। আবার কোনও তীর্থক্ষেত্রেও সাময়িক কালের জন্য বছরের নির্দিষ্ট সময়ে *মণ্ডি*-র উপস্থিতি দেখা যেত। এগুলি বসত সাধারণত কোনও নদীর তীরে এবং এদের বলা হত *হাট* বা *পেট*। এগুলি কিন্তু কোনও গ্রামের অংশ ছিল না।

যেসব গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো ছিল সেখানে কারিগর শ্রেণীর উপস্থিতি দেখা যেত। অবশ্য এ জাতীয় গ্রামের আয়তন ছিল বড়ো, কারণ ছোটো ছোটো গ্রামগুলি মূলত কৃষিজীবীদের নিয়ে গঠিত হত। ভারতে এমন বহু গ্রাম ছিল যেগুলি একটিমাত্র কারিগরী শিল্পের জন্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। কারিগরদের ব্যক্তিগত যন্ত্রপাতি, উদ্ভাবনীশক্তি এবং দক্ষতার ওপরই প্রধানত শিল্প উৎপাদনগুলি নির্ভর করত।

Scanned with CamScanner

সিয়াকনামা-কে উদ্ধৃত করে ড. গ্রোভার দেখিয়েছেন যে বহু কারিগর নিজের গ্রামের *জমিন্দার*-দের কাছ থেকে নিষ্কর জমি ইনাম হিসাবে লাভ করত। আবার অনেক সময়ে কোনও *জমিন্দার* নিজের এলাকায় দক্ষ কারিগরদের এনে বসতি করতে উৎসাহ দিত। কোনও কোনও অঞ্চলে *জমিন্দার* নিজেই স্থানীয় কৃষিপণ্য নিয়ে ব্যবসা করত। সুজন রাইয়ের *খুলাসাৎ-ই-তারিখ* উদ্ধৃত করে বলা যায় যে, মুলতান এবং গুজরাট সুবার গুর্জর উপজাতি গবাদি পশু ইত্যাদি নিয়ে এক অরণ্য থেকে অন্য অরণ্যে যেত এবং পথে তারা সেগুলি বিক্রি করত। আবার কিছু মরসুমি বাণিজ্যও চলত। বাণিজ্যের বিনিময়ে তারা সরকারকে কিছু শুল্ক ধরে দিত।

কসবা-তে কারিগররা কিন্তু বিশেষ বিশেষ অঞ্চলেই বসতি করত। এভাবেই বিশেষ কারিগরী পণ্য নির্দিষ্ট এলাকাতেই পাওয়া সম্ভব ছিল। ভারতীয় শহরে কামারপাড়া, কুমোরপাড়া, তাঁতিপাড়ার বিকাশ ঘটেছিল এভাবেই। অবশ্য কোনও *কসবা*-র অর্থনৈতিক জীবন নির্ভর করত ভৌগোলিক কাঠামো, জলবায়ু এবং সেই অঞ্চলে প্রাপ্ত কৃষিপণ্যের ওপর। আবার ভারতে ঐতিহ্যগতভাবে সমাজ গড়ে উঠেছিল পেশাভিত্তিক। ফলত বংশপরম্পরায় শিল্পী ও কারিগররা নির্দিষ্ট একটি পেশায় নিযুক্ত থাকত এবং দক্ষতা অর্জন করত।

প্রথমত, নির্দিষ্ট অঞ্চলে নির্দিষ্ট পেশার বিকাশ এবং তা বংশানুক্রমিকভাবে হওয়ায় কারিগরদের সংঘ (Guild)-গুলি গড়ে উঠতে পেরেছিল। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য উভয়েরই বিকাশ ঘটায় ওই সংঘগুলি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তারা যেমন পণ্যের মান ও বাজারদর ঠিক করত তেমনি কারিগরদের আচরণবিধি নির্দিষ্ট করত। বহু ক্ষেত্রে স্থানীয় *জমিন্দার*-রা এইসব কাজ নিজেরাই করত। আবার কারিগররা নিজেরাই নিজেদের নেতা চয়ন করত এবং পরগনা স্তরে নিয়মিত প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল। শ্রমিকের মজুরি এবং বণিকের লভ্যাংশ সবকিছুই বহুক্ষেত্রে এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বারা স্থিরীকৃত হত। *সুবা* বাংলায় এই ব্যবস্থা যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। বণিক ও কারিগরদের সংঘ এবং হাট ও বাজারের *পঞ্চায়েত*—এই দুটি কেন্দ্র থেকেই গ্রামীণ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হত। বাজারের বণিক ও দোকানিদের সম্পর্কে যেমন বিস্তারিত তথ্য রাখা হত তেমনি কারিগরদের এলাকায় কোনও কারিগর বা তাঁতি কী পরিমাণ উৎপাদন করত তারও হিসাব রাখা হত। কোনও সদস্য বিপদে পড়লে তাকে নানাভাবে সাহায্য করার ইতিহাসও আছে। যেহেতু সরকারের পক্ষে বাণিজ্যের ওপর শুল্ক (*সেয়ার-জিহাত*) ধার্য ও আদায় করা হত সেহেতু সরকারি আমলা ও *জমিন্দার*-রাও নিয়মিত বাণিজ্য ও উৎপাদনের ওপর নজর রাখত। এই কাজে প্রধান ব্যক্তি ছিল বণিক ও কারিগরদের নেতা যাকে সাধারণভাবে বলা হত *চৌধুরী*।

চৌধুরী-র মারফত মূলত স্থানীয় উৎপাদক ও বণিকরা গ্রাম ও শহরের বাজারগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। সেই যোগাযোগ বিস্তৃত ছিল বড়ো বড়ো বাণিজ্যকেন্দ্র ও বন্দরে। তাদের বলা হত *সাহ* বা *সাহুকার*। এরা ছিল যথেষ্ট ধনী এবং পণ্যসামগ্রী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তারা নানা প্রান্তে *দালাল*-দের নিযুক্ত করত। *দালাল*-রা কাঁচামাল, নগদ অর্থ ইত্যাদি নিয়মিত জোগান দিত এবং তৈরি পণ্য সংগ্রহ করত। পাশাপাশি

Scanned with CamScanner